# সারসংক্ষেপ (Abstract)

ক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে যে শব্দার্থতত্ত্ব গড়ে ওঠে, তাকে 'ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থতত্ত্ব' বলে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের শব্দতাত্ত্বিক যাস্ক তার 'নিরুক্ত' গ্রন্থে শব্দকে নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত এই শ্রেণিকরণের পক্ষে দাঁড়িয়ে 'সমস্ত নাম শব্দই ক্রিয়া থেকে নিষ্পন্ন' -- এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। নাম শব্দের অন্তর্গত ক্রিয়া অনুসন্ধানের অনেক প্রক্রিয়া রয়েছে। আপাতভাবে কোন শব্দের যদি ক্রিয়ার(ধাতু বা Verb root) সন্ধান না পাওয়া যায়; তবে তিনি বর্ণসামান্যের আশ্রয় নিতে বলেছেন। অর্থাৎ বর্ণার্থ বিশ্লেষণ করে শব্দের অর্থ নির্ণয় করতে হবে, এই হল যাস্কের নিদান। এবং এখানেই এই শব্দার্থবিধি 'বর্ণভিত্তিক'। অর্থাৎ যাস্কের মতানুসারে প্রাচীন শব্দমাত্রই ক্রিয়ানির্ভর। উপসর্গ, প্রত্যায়াদি সেই ক্রিয়াকে বিশেষ দিশায় চালিত করে।

যাস্কাচার্যের সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে এগোতে এগোতে আমরা দেখেছি, সংস্কৃত ও বাংলা বর্ণগুলির প্রত্যেকটি বিশেষ অর্থ ধারণ করে এবং সে অর্থ ক্রিয়াভিত্তিক। যেমন -- চালক = চালনা করে যে(ক এখানে করা), জলদ = জল দান করে যে (দ এখানে দান), অজ = নেই জনন যাহাতে ( অ এখানে না করণ; জ এখানে জনন) ইত্যাদি। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থে বহু বর্ণের অর্থ সরবরাহ করেছেন। অর্থাৎ কোন শব্দের অর্থ নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষবৃত্তিতে যদি ক্রিয়ার খবর না পাওয়া যায়; তবে বর্ণ ধরে শব্দার্থ নিষ্কাশন চলতে পারে। কিন্তু শব্দের অন্তরে যে ক্রিয়ার খবর রয়েছে সে ব্যাপারে যাস্কাচার্য নিশ্চিত। নিরুক্তে তিনি তাঁর মতামতের সমর্থনে প্রাচীন শব্দতাত্ত্বিক শাকটায়ন প্রমুখের মতামতকে তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় এই শব্দতাত্ত্বিকদের মতে, শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক বাচ্য-বাচক নয়; প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকের।

প্রাচীন ভারতীয় শব্দগুলির একটি বড় গুণ হল 'ব্যাপ্তিমত্ত্বা'। অর্থাৎ শব্দার্থ ব্যাপ্ত হতে পারে। কীভাবে এটা সম্ভব? আসলে যেহেতু আড়ালে রয়েছে একটি ক্রিয়া,; যে

সত্তাই সেই ক্রিয়া সম্পাদন করছে, সে ই  উক্ত ক্রিয়াটির কারী হয়ে যাচ্ছে। তাই অজ (নেই জনন যাহাতে) বললে যেমন সয়ম্ভু ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবকে বোঝায়; তেমনি জনন ক্রিয়ায় অক্ষম ছাগল, বদ্ধপুরুষ বা অজপাড়াগাঁকেও(unproductive village) বোঝায় -- এদের সবারই ভেতরে এক ক্রিয়া 'জননহীনতা' বিদ্যমান।

সংস্কৃত, বাংলা প্রভৃতি প্রাচীন ভাষাগুলির বেশিরভাগ শব্দ একসাথে অন্তত তিনটি স্তরে অর্থ প্রদান করে থাকে -- জড়জাগতিক অর্থ, সামাজিক অর্থ ও স্বর্গীয় অর্থ। প্রাচীন ঋষিদের কাছে মন্ত্রার্থ এই তিনেরই সর্বোচ্চ রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু মানুষের মেধা-মনন শক্তি কমে যাওয়ার সাথে সাথে মানুষ প্রথমে স্বর্গীয় অর্থ; তারপর সামাজিক অর্থ এবং শেষে জড়জাগতিক অর্থকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা হারাতে থাকে। তাই প্রাচীনকালে মন্ত্রার্থের যথার্থ অর্থকে ধরে রাখার প্রয়োজনে লিখিত হয়েছিল 'নিঘণ্টুকোষ'। তারই ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'নিরুক্ত'। শব্দের এই তিনটি স্তরের মধ্যে 'সামাজিক স্তর'টি নিয়ে আমাদের কারবার। আমাদের কাছে তাই 'বরাহ'(বর + আ - √হন্ + অ(ড) - কর্ত্তৃবাচ্যেঃ বঙ্গীয় শব্দকোষ) মানে কেবল শূকর নয়, 'যাহাকে বরণ করিয়া (তাহার দ্বারা অন্যকে) আহনন করা হয়' তাকে বোঝানো হচ্ছে। সে শূকর হতে পারে (রদতি ভূমিং শূকরঃ - দ্রঃ বঙ্গীয় শব্দকোষ) আবার রাষ্ট্র নিয়োজিত কর্মচারীও হতে পারে। 'আম'(আ + √অম্(গতি) + অ(ঘঞ্) - কর্ম্মবাচ্যেঃ বঙ্গীয় শব্দকোষ) মানে কেবল ফলবিশেষ নয়; 'যাহা পীড়িত করে', ঈষৎ অগ্নিপ্রাপ্ত বা পক্ক; অপক্ক, অসিদ্ধ, কাঁচা এমন মলবৈষম্য (আমাশয়) হতে পারে আবার আম জনতাকেও বোঝাতে পারে। এভাবেই প্রাচীন সংস্কৃত শব্দগুলি বহুরৈখিক অর্থধারণ করত। তার মধ্য থেকে আমরা সামাজিক অর্থটিকে গ্রহণ করে তার দ্বারা রামায়ণকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি।

আমাদের অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ের নাম 'ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থতত্ত্ব'। যাস্কাচার্যের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সব নামশব্দই যেহেতু ক্রিয়া থেকে নিষ্পন্ন তাই আমরা শব্দার্থের ব্যাপ্তিমত্ত্বা গুণটি ব্যবহার করে রামায়ণের চরিত্রগুলির সামাজিক অর্থ নিষ্কাশনের চেষ্টা করেছি। তার কারণ বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ

গ্রন্থাদি লিখিত হয়েছিল ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায়। তাই আমরা বর্তমানের Logo-centric শব্দার্থবোধের কারণে বুঝে উঠতে পারি না, 'যমের মাতার বিবাহ হওয়ায় বিবস্বানের স্ত্রীর মৃত্যু ঘটিল' (ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল, ১৭শ সুক্ত) কেন? বা 'অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, আবার দক্ষ হইতে অদিতি জন্মিলেন' (ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল, ৭২ সুক্ত) কীভাবে?

যাই হোক স্বয়ং বাল্মীকি থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পেরিয়ে বহু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গবেষক, বিদগ্ধ পণ্ডিত মনে করেন রামায়ণে নিহিত রয়েছে ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ইতিহাস। কিন্তু সেই ইতিহাসের দরজায় যে প্রাচীন তালাটি আঁটা, তার চাবিকাঠি এই ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থতত্ত্ব। এদিক থেকে আমাদের কাছে রামায়ণ নিছক বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী নয়; সময় ও সমাজের দলিল।

দ্বিতীয় অধ্যায় তথা 'ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থত্ত্বের আলোয় রামায়ণের চরিত্র' অধ্যায়ে চরিত্রগুলির সেই সামাজিক সত্তা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় তথা 'রামায়ণের ঘটনায় নিহিত ভারত ইতিহাস' অধ্যায়ের প্রথম ভাগে সপ্তকাণ্ড রামায়ণের মোটাদাগের গল্পটিকে ধরে সামাজিক সত্তাগুলি কীভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করেছে তার উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে। ভারত ইতিহাসের একটি বিরাট কালপর্ব; একটি বিরাট জনপদ ও একটি বিরাট বিপ্লবের কাহিনী শায়িত রয়েছে রামায়ণের গল্পে। খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ বা তারও কিছু পূর্ব থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ বা তারও কিছু পরের ইতিহাস রূপকের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে রামায়ণের গল্পে। প্রথম ভাগে গল্প ধরে তা উদ্ধারের চেষ্টা ও দ্বিতীয় ভাগে তৎকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসটা দেখে নেওয়া হয়েছে; এবং আশ্চর্যভাবে তাদের মধ্যে বহু মিল লক্ষ্য করা গেছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের নাম 'রামায়ণে নিহিত ভারত অর্থনীতি'। এই অধ্যায়ের প্রথম ভাগে নগদ-নারায়ণের 'দশাবতারতত্ত্ব' ব্যাখ্যা করা হয়েছে ও পরে রামায়ণে বর্ণিত ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসটা প্রামাণ্য বিশেষজ্ঞদের গ্রন্থাদি অবলম্বনে দেখে নেওয়া হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের নাম 'সামগ্রিক প্রাপ্তির একত্রীকরণ'। এখানে আগের অধ্যায়গুলিতে যে প্রাপ্তি ঘটেছে তার সার সংক্ষেপ করা হয়েছে। পাশাপাশি ইতিহাসের সঙ্গে রামায়ণের ঘটনাগুলির সাদৃশ্য মিলিয়ে দেখার চেষ্টা হয়েছে।

আমাদের ষষ্ঠ অধ্যায় 'উপসংহার'। এই অধ্যায়ে রামায়ণকে অতিক্রম করে ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থতত্ত্বকে আশ্রয় করে মহাভারতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার দেশলাইটুকু ঠোকা হয়েছে মাত্র। একটা Counter revolution-এর গল্প লুকিয়ে রয়েছে মহাভারতের অমৃতসমান কথায়। তারই চকিত দর্শন করে আমাদের অভিসন্দর্ভের সমাপ্তি টানা হয়েছে।